ভ্যানগার্ড: প্রয়োজনীয় পুরুষেরা

মুস্তফা হুসাইন

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَ مَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا

"মুমিনদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সাথে তাদের করা অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ (অঙ্গীকার পূর্ণ করে) গত হয়েছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকার কোনো পরিবর্তন করেনি।" (সূরা আহযাব ৩৩:২৩)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ-

(إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحله) متفق عليه

"নিশ্চয়ই মানুষ এমন একশোটি উটের ন্যায়, যেগুলোর মধ্যে হতে আরোহণযোগ্য একটি উট পাওয়া যাওয়াও দুর্লভ"। (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সমস্ত উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি আমাদের পাঠিয়েছেন মানবজাতিকে হেদায়েতের পথে নিয়ে আসার জন্য, মানব জাতির উপর চেপে বসা সমস্ত জুলুম-নির্যাতনের অবসান ঘটানোর জন্য। সৃষ্টির ইবাদত করা থেকে বের করে কেবল মাত্র সমগ্র জাহানের সৃষ্টিকর্তা একক আল্লাহর ইবাদতে নিয়ে আসার জন্য। প্রত্যেক যুগের সত্যবাদী, মনোনীত ব্যক্তিরা এই মহান দায়িত্বকে পালন করেছেন ধৈর্য এবং দৃঢ়তার সাথে। তারাই হলেন যুগের মনোনীত, মুহসিন ব্যক্তিবর্গ! আর এই মনোনীত ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সুসংগঠিত মেহনত ছাড়া ইসলামের দাওয়াতের প্রতিষ্ঠার কথা ভাবাই যায় না।

সুবহানআল্লাহ! ইসলাম কতই না মহান। আর দুনিয়াতে ইসলাম ফিরিয়ে আনতে মহান ব্যক্তিদের কতই না প্রয়োজন। আর এই মহান ব্যক্তিদের কাছে আমাদের নূন্যতম কিছু চাহিদা রয়েছে—

1) পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন ফিকর

2) উদাসীনতা ত্যাগ ও উদ্যমী মানসিকতা

3) ইলম ও নেতৃত্বের ভারসাম্য

4) হিম্মত

যখন কোনো মুমিন এই মহান দ্বীনের জন্য নিজ প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে শুরু করে স্বীয় জীবনকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়, তখন তার জন্য অত্যাবশ্যক হল সঠিক ফিকর ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার সুন্নাহ বা সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনা কারো পক্ষপাতিত্ব করে না। ইলাহি রীতি অনুযায়ী মুমিন-কাফির সকলেই এক্ষেত্রে সমানভাবে বিচার্য হয়। মুমিন বা কাফের উভয়ের জন্যই পানি ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফুটতে শুরু করবে; মুমিনের জন্য তা ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফুটতে শুরু

করবে না। আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ তাওফিকের কথা ভিন্ন বিষয়।

বিষয়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে বোঝা যায় শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহঃ এর বক্তব্য থেকে—

> "আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত কাফির রাষ্ট্রকে সাহায্য করেন ও টিকিয়ে রাখেন। আর অত্যাচারী জালিম রাষ্ট্র তা মুসলিমদের হলেও পরাজিত করেন ও ধ্বংস করেন।"

অর্থাৎ, সন্দেহাতীতভাবে যে কোনও রাষ্ট্র, তানজীম বা ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হল আদল ও ইনসাফ। আল্লাহ তা'আলার রীতিনীতি সকলের উপর সমানভাবে ক্রিয়াশীল। মানুষের উপর ইলাহি রীতির যে স্রোত আছড়ে পড়ে, তা একজন মুসলিমকেও প্রভাবিত ও ব্যথিত করে। নিয়তের বিশুদ্ধতা, উত্তম গন্তব্য বা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ইলাহি রীতির পরিবর্তন ঘটায় না, যদিও এসবই নেক আমল কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় শরীয়তে যত আদেশ-নিষেধ পছন্দ-অপছন্দনীয় বিষয় সাব্যস্ত করেছেন; তার প্রতিটিতেই জাগতিক কোন না কোন সমাধান আছে। আল্লাহর রাসূল (সা) এর প্রতিটি সুন্নাহর অনুসরণে আখিরাতের সফলতার পাশাপাশি দুনিয়াবী কোন না কোন উপকারিতা ও সমাধান নিয়ে আসে। তাই কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্ তা'আলার শরীয়তের বিধি-বিধান সুন্নাহ অনুযায়ী পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে, তাহলে সে অবশ্যই দুনিয়াতে ইলাহী ওয়াদার বাস্তবায়ন দেখতে পাবে। দুনিয়াতে ও আখিরাতে সে হবে সৌভাগ্যবান।

যখন কোনো বান্দা বা জামাত দুনিয়াতে আগত বালা-মুসিবতের ফলে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা ছাড়া কোনো কিছুই দেখতে পায়না, তখন বুঝে নিতে হবে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম পালনে অথবা আল্লাহর রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ বোঝা ও অনুসরণে তার ঘাটতি রয়ে গেছে। একজন মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন; নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইলাহী রীতি না তার পক্ষপাতিত্ব করে, আর না বিরুদ্ধাচরণ করে। আর এমন হওয়াটা রবের পক্ষ হতে তার বান্দার প্রতি তার নিয়ামতের পূর্ণতার নিদর্শন। একেক মানুষের জন্য আগুন আর পানির উত্তাপ একেক রকম হওয়া নিঃসন্দেহেই পরিস্থিতি জটিল করে তুলতো। আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ বান্দাদের জন্য বরাদ্দ তাওফিকের বিষয়টি বিশেষ ক্ষেত্র, সাধারণ বাস্তবতা না।

আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াকে স্বীয় সুব্যবস্থাপনা দ্বারা কায়দা কানুনের আবাস বানিয়েছেন। এসকল কায়দা পরিত্যাগ করা বা এর বিপরীতে চলা সঠিক নয়। তাই ইসলাম ফিরিয়ে আনার পথে যারা কাজ করবেন তাদের জন্য সবার আগে প্রয়োজন ফিকর ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচ্ছন্নতা অর্জন।

'উদাসীনতা' নামক ভয়াবহ ব্যাধিটি কীভাবে উম্মাহকে গ্রাস করেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। ব্যক্তি, দল নির্বিশেষে বিক্ষিপ্ত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন কর্মকাণ্ড উম্মতের বোঝা লাঘবের পরিবর্তে বিপরীত ফলাফলই বয়ে আনছে। এই উদাসীনতা আজ উম্মতের অসংখ্য উত্তম আত্মাগুলোকে আক্রান্ত করে ফেলেছে। অথচ, আজ ইসলাম আমাদের কাছে বিশুদ্ধ অবস্থায় পৌঁছেছে পূর্ববর্তী প্রজন্মের মুসলিমদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই। মুহাদ্দিসগণ উম্মাহর কাছে সহীহ হাদীস পৌঁছাতে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ ও প্রেক্ষাপটের পূর্বাপরের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি। যার ফলাফল আমাদের সামনেই রয়েছে। ইসলামের ইমামগণ ইলম, জিহাদ বা দাওয়াতের ক্ষেত্রগুলোতে ছিলেন সমহিমায় উজ্জ্বল।

ইমাম মালিক রাহঃ উদাসীন ব্যক্তির ডাকে সাড়া দিতেন না। তিনি কেবল এমন ব্যক্তির আহ্বানেই সাড়া দিতেন যে কি না অধিক যিকির ও ইবাদতের মাধ্যমে নিজেকে কর্মচঞ্চল রাখতেন। দুঃখজনক বাস্তবতা তো এই যে, আমরা নিজেরা তো উদাসীন, তার উপর কেউ আমাদের কল্যাণকামী হয়ে উদ্যমের দিকে আহ্বান করলে তাকেও আমরা শত্রু ভাবতে শুরু করি।

এছাড়াও, ইসলামের পুনরুত্থানে অগ্রগামী ভূমিকা রাখতে আগ্রহী জামাত ও সচেষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচ্ছন্ন ফিকর, বাস্তবতা ও শারঈ ইলমের উপলব্ধি এবং উদাসীনতা পরিত্যাগের পাশাপাশি আরও প্রয়োজন—নেতৃবৃন্দ ও উলামায়ে কেরামের ভারসাম্যপূর্ণ সহাবস্থান।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহঃ সুন্দর বলেছেন, আমির-উমারাদের উচিৎ শারঈ অভিভাবকদের থেকে উপকৃত হওয়া। তবে দ্বীনী

অভিভাবকেরা যেন আমির উমারাদের আজ্ঞাবাহী না হয়ে ওঠেন তা নিশ্চিত করতে হবে। কেননা, তা কোনোভাবেই উত্তম ফলাফল আনবে না। মানুষের মাঝে সম্পর্ক দুই প্রকার হয়ে থাকে; দ্বীনী সম্পর্ক এবং জাগতিক সম্পর্ক। আর মানুষের স্বভাবজাত দুর্বলতা এই যে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পর্কের ব্যাপারে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেনা। তাই নেতৃবৃন্দ ও উলামাদের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া জরুরী। কেননা, নেতৃবৃন্দ ও উলামায়ে কেরামের মাঝে যথাযথ সমন্বয় ঘটলেই ইসলামের উত্থান সম্ভব হবে। উপর্যুপরি ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ, স্থবির চিন্তাধারা এবং প্রায়োগিক বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ না থাকায়, উলামায়ে কেরাম ও নেতৃবর্গের সমন্বিত সম্পর্ক অত্যাবশ্যক।

তারপর প্রয়োজন হিম্মত। যা হচ্ছে—ইচ্ছাশক্তি ও কাজের বাস্তবায়ন সমন্বিত রূপ। পরিষ্কার উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও ফিকর ব্যতীত কেবল হিম্মত কোনো ফলাফল নিয়ে আসতে পারে না। আমাদের সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী বিভিন্ন ইসলামি জামাত আমাদের জন্য এর প্রমান রেখে গেছে। তবে যদি কোনো মহান উদ্দেশ্য হাসিলের হিম্মত বা বৈপ্লবিক মানসিকতা না থাকে তবে আমাদের জন্য তাত্ত্বিক কিছু অর্জনের বাইরে ভিন্ন কিছু অর্জন সম্ভব হবে না। বছরের পর বছর একই বৃত্তে, একই সমস্যার দুষ্টচক্রে ঘুরপাক খাওয়ার কোনো বিকল্প থাকবে না।

মুসলিমদের হিম্মতের মূল চালিকাশক্তি হতে হবে তাদের ইমান, তাকওয়া ও গন্তব্যের সঠিকতা। আমাদের এই পথ আসহাবুল উখদুদের পথ। জমিনে তামকিন লাভ আমাদের অনেকের বা কারো পক্ষেই দেখে না যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই শাহাদাত অর্জনের আগ পর্যন্ত পূর্বসূরীদের পথের উপর অটল-অবিচল থাকার মাধ্যমেই আমরা দুনিয়া আখিরাতের সফলতা অর্জন করতে পারব। কাপুরুষতা আমাদের মোটাতাজাও করবে না, হায়াতও বৃদ্ধি করবে না। সাহসিকতা ও সুউচ্চ হিমত অর্জনে অগ্রগামী হওয়া উম্মাহর মহান ব্যক্তিদের জন্য আবশ্যক। জীবন অবসানের আগ পর্যন্ত নিজের মেধা, শক্তি, সময় ও প্রচেষ্টার যতটুকু সম্ভব ব্যয় করার মাধ্যমেই আমরা নিজেদের কাঙ্ক্ষিত মর্যাদা হাসিল করতে পারবো এবং পারবো পরবর্তী প্রজন্মের নির্বিঘ্নে ইসলাম পালনের রাস্তা সহজ করতে।

পরিশেষে একথা মনে রাখা প্রয়োজন — সংগ্রাম মানেই শুধুমাত্র অস্ত্রের ঝংকার নয়। যুদ্ধ হলো বিবাদমান দুটি পক্ষের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়। যুদ্ধ মূলত একটি প্রতিষ্ঠানের ন্যায়। এর মাঝে রয়েছে সুদৃঢ় ও সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা, রব্বানী নেতৃত্ব, মজলুম ও সালেহিনদের দুয়া, ঘাত-প্রতিঘাত, উড়ন্ত খুলি ও রক্তাক্ত দেহের সমারোহ। তাই বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা বা কর্মকান্ডকে আঁকড়ে ধরে অগ্রসর হওয়া কাম্য নয়।

[২]

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহবান করে, সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে আর এরাই সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান, ০৩:১০৪)

২য় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী শক্তি 'বিগ ফাইভ' (আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড) তথা নিরাপত্তা পরিষদের নেতৃত্বাধীন বৈশ্বিক সংগঠন 'জাতিসংঘ' নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পাশাপাশি, ইসলামপন্থীদের নানামুখী দ্বিধাবিভক্তির দরুন মুসলিম উম্মাহর মাঝে শাসন ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, পশ্চিমা মানসিকতার প্রভাব ব্যাপকতা লাভ করে। যার ফলে, সমাজ ও রাষ্ট্রে শরীয়াহর কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনার প্রশ্নে, একটি সুনির্দিষ্ট উত্তর সবাই গ্রহণ করে নিয়েছে। সাধারণ লোক, তালিবে ইলম থেকে নিয়ে উলামায়ে কেরাম, ইসলামপন্থী নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহের এক বড় অংশ এই চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন! আর তা হচ্ছে, উম্মাহর বৃহত্তর অংশ সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এগিয়ে না আসলে ইসলামের বিজয় অসম্ভব! এ চিন্তাধারা উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে স্থবিরতায় আটকে রেখেছে।

আল্লাহর রাসুল (সা.) এর জীবনে আমরা দেখি যে, তিনি (সা.) প্রায় বিশ বছরের মেহনতে এমন ১৪০০ ব্যক্তি প্রস্তুতেই অধিকতর মনোযোগ দিয়েছেন, যারা পরবর্তীতে ইসলামের আমানত বহন করে মাত্র ৮০ বছরের মাথায় তা গোটা দুনিয়াতে পৌঁছে দিতে সক্ষম

হয়েছেন। যখন অগ্রবর্তী ব্যক্তিদের জামাত সংগ্রাম আর সফলতার অভিমুখ ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ফেলে, তখন জাতি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তাদের পেছনে একতাবদ্ধ হয়ে যায়। তাই সেক্যুলার শাসকদের শোষণ ও ক্রোধ উদ্রেককারী ঘটনাপ্রবাহের প্রতিক্রিয়ায় উম্মাহ নিজে নিজেই বিজয় এনে দেবে এমন চিন্তা বাস্তবসম্মত নয়। আবু হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সূরা নাসর তিলাওয়াত করে বলেন,

> "সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! আজ মানুষ যেভাবে হক থেকে বের হয়ে যাচ্ছে যেভাবে মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল।"

আমরা দেখতে পাই, সংগঠনগুলো, রাজনীতিবিদ ও তাত্ত্বিকরা উম্মাহকে ব্যাপকভাবে নিজ নিজ কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত করে 'নিরাপদ আন্দোলন' বা 'সহজ জিহাদ' এর পথ ধরে বিজয় ও শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার কথা বলে থাকেন। বাস্তবে এই চিন্তাধারার কোন ফলাফল কি দেখতে পাই? তারা কি আদৌ তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে? তারা কি পেরেছে নিরাপদে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছাতে?

উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপর নির্ভরশীল হওয়ার বিষয়টি আমাদের দ্বীন, উলামায়ে কেরাম এবং মুসলিমদের ভুমিগুলোকে লাঞ্ছিত আর অপমানিত করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর নির্ভরতা সেক্যুলার ক্ষমতাশীল জল্লাদদের উল্লাসিত করেছে। এই মানহাজ কাঙ্ক্ষিত সফলতা এনে দিতে পারেনি। আর যে বা যারাই উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর নির্ভর করে কর্মসূচী সাজিয়েছে, ব্যর্থতা ছাড়া তারা কিছুই অর্জন করেনি।

লক্ষণীয়, আমরা উম্মাহর প্রতি লক্ষ্য রাখব; আমাদের দাওয়াতি ও রাজনৈতিক কর্মসূচীর সিংহভাগই হবে উম্মাহকেন্দ্রিক। কিন্তু উম্মাহর উপর নির্ভরতা, উম্মাহর মাঝে দ্রবীভূত হয়ে যাওয়া আমাদের আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করবে না। বরং, এরকম আন্দোলন এক পর্যায়ে মানুষের রুটি-রুজির খোরাক মেটানোর আন্দোলন হয়ে যায়। আমাদের সংগ্রাম তো রুটি-রুজির জন্য নয়, যদিও তা আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যমে পূরণ হয়ে যাবে। বরং, আমাদের আন্দোলন হচ্ছে জমিনে ইসলামের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনার আন্দোলন।

উপরের আলোচনা থেকে এমনটা বোঝার কারণ নেই যে, উম্মাহকে তাকফির করা হচ্ছে বা উম্মাহকে পরিত্যাগ করার কথা বলা হচ্ছে। বরং, এখানে বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে সঠিক কর্মসূচীর দিকে আহবান করা হচ্ছে। সঠিক ও উপযোগী নেতৃত্ব মানুষকে সঠিক দ্বীনের উপর ঐক্যবদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। স্রেফ জনরঞ্জনবাদী পথ আঁকড়ে ধরে ক্ষমতার চূড়ায় আরোহণ করেনা। কেননা এতে সাময়িক সফলতা যদি আসেও, তা টিকে থাকবে না।

দশকের পর দশক সেক্যুলার শাসকদের প্রতারণা ও নোংরামির শিকার উম্মাহ কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নিজ সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রতিরক্ষায় সক্ষমতা দেখাতে পারেনি। সেক্যুলার বুদ্ধিজীবি, তোতাপাখিসদৃশ মিডিয়া আর দরবারী আলেমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে দ্বীন ও বাস্তবতা পাল্টে দিতে। ফলে, উম্মাহর আকিদায় ব্যাপকভাবে প্রবেশ করেছে ইরজা ও শৈথিল্যপরায়নতার জীবাণু। সামগ্রিকভাবে মুসলিমরা মানসিকভাবে পরাজিত। সব রকমের বিপদ তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরেছে । সাম্প্রতিক সময়ে আমরা মিশর, তিউনিসিয়া ও অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহে লাখ লাখ মানুষকে আন্দোলন করতে দেখেছি। আমরা দেখেছি উৎসাহী মানুষের ভিড়। দেখেছি মানুষের রাস্তায় নামা, ভাঙচুর, আস্ফালন আর অগ্নিসংযোগ। এসবের চালিকাশক্তি ছিল ক্ষুধা, রুটি বা বৈষয়িক কোন দুর্যোগ। আন্দোলনরত এক ব্যক্তি যখন নিজ গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় তখন কেউ তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি।

উম্মাহ অত্যাচারী শাসকের পতনের জন্য একত্রিত হয়েছিল, বিক্ষোভ করেছিল। ফলাফল ছিল এই যে, উম্মাহর এই আন্দোলন এক সেক্যুলার শাসককে অপসারণ করে তার স্থলে আরেক সেক্যুলার শাসককে বসিয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অর্জন ছিল শুধুমাত্র চেহারায় পরিবর্তন। প্রতারণার শিকার হওয়া থেকে উম্মাহ নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি। কেননা, আদর্শ বা দ্বীনকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন দাঁড়ায়নি।

আরো কিছু কারণ হচ্ছে জনগণের এই বিশাল অংশটিকে নেতৃত্ব দেয়ার উপযোগী আদর্শিক দৃঢ়তা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বৈপ্লবিক চেতনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংগঠন, ভ্যানগার্ড তথা অগ্রবর্তী বাহিনীর অনুপস্থিতি। যার ফলে, আন্দোলনসমূহের অভিমুখ নিয়ন্ত্রণ করছিল একই আদর্শের ভিন্ন চেহারার অন্য কোনো সেক্যুলারেরা। শাসকগোষ্ঠী আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য বিভিন্ন মিথ্যা

প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণকে আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ব্যাপারে অমনোযোগী করে ফেলতে পারে। কেননা, সেক্যুলার শাসনব্যবস্থার অধীনে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করা জনগণ নিজেদের মানোন্নয়নে সক্ষম ছিল না।

আরব বসন্তের সময় ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে 'মধ্যমপন্থী' সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তারাও মিশরে জনগণের উপর ভর করে, জনতুষ্টির পথ ধরে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিল। এবং তারা এটি ভেবেও নিয়েছিল যে, তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হতে চলেছে। কিন্তু যখন জনগনের দুনিয়াবি চাহিদা পরিপূর্ণ হলো না, তখনই প্রেক্ষাপট পাল্টে গেল। ক্ষমতা থেকে তারা অপসারিত হলো এবং তাদের নেতাদের পাশাপাশি কর্মীদেরকেও ঢালাওভাবে জেলে পাঠানো হলো। জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাদের অভিশাপ দিতে লাগলো। এমন কি কেউ কেউ নেতৃবৃন্দের মুখে জুতা নিক্ষেপও করে। তাই শিক্ষা নেয়া উচিৎ। ধোঁয়াশাপূর্ণ স্লোগানের আশ্রয়ে জনগণকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে পরিচালিত আন্দোলন যেন প্রকৃত ইসলামপন্থীদের মৌলিক প্রচেষ্টা না হয়।

জনচাহিদাকে উপেক্ষা করা উচিৎ নয়, তবে জনচাহিদার লেজুড়বৃত্তি ও তোষণনীতি নিঃসন্দেহে আন্দোলনকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে! প্রতিটি সুযোগকে আন্দোলনের অনুকূলে নিয়ে আসা দরকার, তবে তা যেন আমাদের প্রতারিত না করে। বিপ্লবী চিন্তার আন্দোলনকারীদের জন্য সমীচীন নয় যে, তারা জনগণের মাঝে দ্রবীভূত হবে। যদিও এই দ্রবীভূত হওয়াটা রাজনীতিবিদ আর তাত্ত্বিকদের খুবই পছন্দনীয়।

আরবের মাঝে যখন নবি (সা.) এর আবির্ভাব ঘটে তখন তিনি (সা.) ছিলেন সকল মানুষের মাঝে স্বর্ণতূল্য। মানুষের মাঝে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে পবিত্র। তিনি ছিলেন অনুপম চরিত্রের অধিকারী এবং সর্বাধিক সম্মানিত। এতদসত্ত্বেও, মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত অল্প কিছু মানুষই তার অনুসরণ করেছিল। আরবের অধিকাংশই নবিজীর (সা.) দ্বীনের অনুসরণ থেকে বিরত ছিল। বরং যারা তার (সা.) অনুসরণকারী ছিলো, এমন কোনো অত্যাচার নেই, যা তাদের ওপর চালানো হয়নি। এমনকি অগ্রগামী মুসলিমরা নিজ দেশ থেকে হিজরত করতে বাধ্য হয়। আল্লাহ্ প্রদত্ত সাহায্য ও বিজয় প্রত্যক্ষ করার আগ পর্যন্ত, আরবরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেনি। বিজয় আসার পর আগে যারা বিরোধিতায় নেতৃত্ব দিয়েছিল, তারাও দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্ষমতা, শক্তি ও বিজয়ের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে মানুষকে একত্রিত করেন, যা শুধুমাত্র দলীল আদিল্লা দ্বারা সম্ভব না।

সুস্পষ্ট বিজয়ের ফলাফলস্বরূপ আরবের অধিকাংশ লোক পরাজিত দ্বীন পরিত্যাগ করে বিজয়ী দ্বীন ইসলাম গ্রহন করে। আবার আমরা এও দেখি যে, মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পর সংঘটিত হুনাইনের যুদ্ধে উম্মাহর নতুন সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি ইসলামের সুনির্বাচিত ও অগ্রগামী অংশের সাথে কেবল তাল মিলিয়ে চলার দ্বারা রাতারাতি উন্নতির শিখরে পৌঁছে যায়নি। বরং, যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে তারা পালিয়েছিল। শেষ অবধি কেবল বাইয়াতে রিদ্বওয়ানে অংশগ্রহণকারী অগ্রবর্তী সাহাবাদের বাহিনীই দৃঢ় ছিলেন। যারা ছিলেন উম্মাহর সুনির্বাচিত ও অগ্রগামী অংশ।

হুনাইনের যুদ্ধের খুব বেশি দিন পরের কথা নয়। রাসূল (সা.) এর ওফাতের পরপরই অধিকাংশ নওমুসলিমরা ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। আরবের লোকদের ব্যাপকভাবে দ্বীনত্যাগের উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় এগিয়ে আসেন আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর নেতৃত্বাধীন উম্মাহর সুনির্বাচিত ও অগ্রগামী মুসলিমদের অংশটি। অবশেষে তরবারির মাধ্যমে যখন মুরতাদদের প্রভাব বিনষ্ট হলো, তখন লোকজন পরাজিত হয়ে নতুন করে ইসলামে প্রবেশ করলো।

এমন উদ্যমী ও অগ্রবর্তী ব্যক্তিবর্গ সব কালেই সবখানেই কিছু না কিছু থাকেন, যারা দ্বীনের প্রকৃত অভিযাত্রী। এরাই দ্বীনের আমানত ও মুল্যবোধ বহন করেন। এই মহান ব্যক্তিদের ব্যাপারে আল্লাহর নবি ? প্রশংসা করেছেন। যেমন সহিহ বুখারীতে আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> আমি রাসুলুল্লাহ ? কে একথা বলতে শুনেছি যে, "মানুষ একশত উটের ন্যায়। তবে তার মাঝে সওয়ারী হিসেবে একটি ও খুঁজে পাবে না।"

ইমাম ইবন বাত্তাল রঃ বলেন—

> “মানুষের সংখ্যা অনেক। তবে পছন্দসই মানুষের সংখ্যা খুবই কম।”

ইমাম আহমদ রঃ এর যমানার লোকেরা দ্বীনের অনেক নিকটবর্তী ছিল। তাদের সময়টা রাসুলুল্লাহর (সা) যমানার খুব কাছাকাছি ছিল। তাদের মাঝে যথেষ্ট উলামায়ে কেরামও ছিল। ইমাম আহমদ রঃ যখন মৃত্যু বরণ করেন, তখন তার জানাযায় লাখ লাখ লোক অংশগ্রহণ করেছিলো। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী যখন তাকে জেলে পুরে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিলো তখন এ লোকেরা কোথায় ছিল? এ বিশাল সংখ্যক লোকগুলো তখন ইমাম আহমদ রঃ ও অন্যান্য হক্কানি উলামায়ে কেরামদের পরিত্যাগ করেছিলো। ফলে বিদআতি শাসকগোষ্ঠী তাদেরকে বন্দী করে নির্যাতন করে এবং কাউকে কাউকে হত্যাও করে। আমরা কি এটা বলতে পারব যে, তিনি জনবিচ্ছিন্ন ছিলেন? বাস্তবতা হলো—তিনি ছিলেন অনুপম চরিত্রের অধিকারী, আহলুস সুন্নাহর ইমাম। স্বীয় যমানায় তিনি ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বরং, সাধারণ মানুষ সাধারণত এমনই হয়ে থাকে।

যাই হোক। আবারো বলছি, জনতুষ্টিবাদী জাতীয় আন্দোলনের শেষ পরিণতি হয় মিশর অথবা তিউনিসিয়ার গণ-আন্দোলনের ন্যায় হবে। যারা প্রতিরোধ পরিত্যাগ করে, নিজেদের অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবে সঠিক কথা হলো, এখনো পর্যন্ত হকপন্থী ইসলামপন্থীরা পতনমুখী সমাজের মাঝে দ্রবীভূত হয়ে যায়নি। বরং, গোটা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে মুজাহিদরা বিভিন্ন ময়দানে সমাজকে স্থিতিশীল ও পরিশুদ্ধ করতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সেক্যুলার শাসনব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলে ইসলামি শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আন্দোলনরত মুজাহিদরাই হচ্ছেন এই জামানার প্রভাবশালী, অগ্রবর্তী ব্যক্তিবর্গ বা ভ্যানগার্ড; যারা নিজেদের কাঁধে উম্মাহর দায়িত্ব বহন করে চলেছেন। এই পথ অত্যন্ত দীর্ঘ ও ধীর গতির। এতে দোষের কিছু নেই, যদিও নির্বোধেরা এটাকে দোষনীয় মনে করে।

এই বিপ্লবীরা মনে করেন, যেহেতু উম্মাহর উপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় তাগুত শাসকগোষ্ঠী চেপে বসেছে এবং সমস্ত সিস্টেমকে তারা কব্জা করে রেখেছে, তাই যথাযোগ্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের অপসারণ যুক্তিযুক্ত। আর দেরীতে হলেও পরিচ্ছন্ন লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারা, ভ্রান্ত গন্তব্যে চলা এবং লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থতা থেকে উত্তম। এই পথের পথিকগণ একথা ভেবে সান্ত্বনা লাভ করেন এবং ধৈর্য ধারণ করেন যে, কিয়ামতের দিন এমন অনেক নবি আসবেন যার সাথে একজন অথবা দুই জন অনুসারী থাকবে। আবার এমন নবি ও আসবেন যার সাথে কেউ থাকবে না।

আকিদা ও চিন্তার পরিশুদ্ধি নিয়ে অধিকাংশ আন্দোলনকর্মী, তাত্ত্বিক, নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সমাজের বড় অংশের কোনো মাথাব্যাথাই নেই। এমন কি কিছু জিহাদের আহবানকারী জামাত ও ব্যক্তিও খুঁজে পাওয়া যাবে, যারা এই নষ্ট সমাজের মাঝে দ্রবীভূত হয়ে গেছে। মানুষের অবস্থা বর্ণনা করে, এমন আয়াতগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই অমনোযোগী। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন-

{ولكن أكثر الناس لا يعلمون}

> কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (সূরা আনআম ৬:৩৭)

{قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون}

> বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝে না। (সূরা আনকাবুত ২৯:৬৩)

{ولكن أكثر الناس لا يشكرون}

> কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের পরও) কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। (সূরা গাফির ৪০:৬১)

কিছু কিছু মানুষ কি এটাই চায় যে, জাতির সকলেই আত্মপূজারী ও নির্বোধদের মাঝে বিলীন হয়ে যাক? বরং তাদের চাওয়া উচিৎ—উম্মাহর উত্তম ও অগ্রবর্তী অংশ যেন সমাজকে শরীয়াহর আলোকে যথাযথভাবে পরিচালনা করেন। দুঃখজনক বাস্তবতা

হচ্ছে, সমাজের মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা বলা লোকের অভাব নেই। তারা শেষ অবধি হয়তো এটাই চাচ্ছে যে, বিশাল সংখ্যা দেখে মোহাবিষ্ট হয়ে এক পর্যায়ে সবাই গণতন্ত্র নামক আধুনিক শিরকে লিপ্ত হোক।

বরং, আবশ্যক তো হলো—জনসাধারণকে সব রকমের পদস্খলন থেকে রক্ষা করা এবং সাধ্যমত জাতিকে বিশুদ্ধ মানহাজের আলোকে পরিচালিত আন্দোলনে শরীক করা; যার ফলে একসময় তারা তাদের অগ্রগামী লোকদেরকে জাতিকে নেতৃত্ব দানের গৌরবময় মহান কাজে শরীক করবে।

স্মর্তব্য যে, সাত আসমানের উপর থেকে নেমে আসা হক কিছুটা বিমূর্ত, ব্যাপক অবস্থায় থাকে। যেহেতু তা সকল সময় ও ভূমিতে সমানভাবে প্রয়োগযোগ্য হবার জন্যই রাব্বুল আলামিন নাজিল করেছেন। আর যুগের আবর্তন বা সমাজবাস্তবতার পালাবদল সত্ত্বেও, যে কোনো সমাজকেই হকের আনুগত্যে নিয়ে আসে, বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল যোগ্য দ্বীনি নেতৃত্ব। যে নেতৃত্ব ইসলাম ও জাহিলিয়াতের বাস্তবতা তুলে ধরে, হকের প্রকাশ (manifestation) নিশ্চিতের মাধ্যমে জনগণকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়।

যেমনটা সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে আমরা নবি সা: ও সাহাবায়ে কেরামের সংগ্রামী জীবনে দেখেছি।

[৩]

ইসলামের উত্থানের জন্য বিশুদ্ধ ইসলামি মানহাজের অনুসারী, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দক্ষতাসম্পন্ন অগ্রগামী বা ভ্যানগার্ড বাহিনীর অপরিহার্যতা যদি বোধগম্য হয়; তাহলে একই সাথে এই প্রশ্নও আসে যে, কীভাবে এই অগ্রবর্তী অংশটি তৈরি হবে এবং উম্মাহর মাঝে আত্মপ্রকাশ করে? কিংবা জাতির মাঝে এমন কোনো অংশ থেকে থাকলে, তা চিহ্নিত করা হবে কিভাবে? কেননা, ইসলামি দলগুলোর সবকটিই তো শারঈ ও বাস্তবতার আলোকে উম্মাহকে নিজেদের দিকে আহবান করে থাকে। তাহলে জাতির ক্রান্তিলগ্নে কারা সঠিক পথ প্রদর্শনে সক্ষম? শুধু শারঈ আলোচনার পাশাপাশি বাস্তবতা ও ইতিহাসের আলোকেই বা কিভাবে সঠিক ভ্যানগার্ড বাহিনীকে চেনা যাবে?

ইতিহাসের দিকে সাধারণ দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, ইউরোপে শুরু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধারাবাহিকতায় নিস্তেজ হয়ে পড়া ইউরোপীয় শক্তিগুলো নিজ উপনিবেশগুলোতে ক্রমাগত আক্রমণের শিকার হতে থাকে। আফ্রিকা ও এশিয়ার যেসব দেশে ব্রিটিশ, ডাচ বা ফ্রেঞ্চ উপনিবেশ ছিল, সেসব দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে-পরে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই হয়। শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যায় পশ্চিমা বানরের পাল। এই সশস্ত্র বিপ্লবগুলোতে নেতৃত্ব দিয়েছেন ওইসব সূক্ষদর্শী রাজনীতিবিদগণ, যাদের সমরবিদ্যায় প্রভুত জ্ঞান ছিল। এমন নেতৃত্বকে 'পলিটিকো-মিলিটারি' নেতৃত্ব বলা হয়। অর্থাৎ, বিশেষায়িত বৈপ্লবিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ বিদায় নিলেও আমাদের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক কাঠামো পুরোদস্তুর পূর্ববর্তী ঔপনিবেশিক আদলেই রয়ে গেছে। তাই, বিশুদ্ধ আকিদা-মানহাজের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত "পলিটিকো-মিলিটারি" নেতৃত্বের অধীনে গঠিত অগ্রগামী বা ভ্যানগার্ড বাহিনী ব্যতীত, ব্রিটিশ উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত সেক্যুলার শাসনের বিরুদ্ধে সাফল্যের আশা করা, ইতিহাস ও বাস্তবতার আলোকে সঠিক নয়।

আর এমন নেতৃত্ব, বাহিনী ও আন্দোলনকে বাস্তবতায় রূপ দিতে যথাযোগ্য তরবিয়ত অপরিহার্য। বিশুদ্ধ আকিদা-মানহাজের সংকটের পাশাপাশি সঠিক আত্মিক, সামরিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক তরবিয়তের অভাবেই যুগের পর যুগ আন্তরিক চেষ্টা ও কুরবানী সত্ত্বেও, হাসান আল বান্না, আবুল আলা মওদুদি বা তাকিউদ্দিন নাবহানিদের দ্বারা শুরু হওয়া আন্দোলনগুলো জাতিকে নেতৃত্ব দিতে ও সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

শাইখ ডক্টর আইমান আল মিসরি বলেন,

> “ইসলামি আন্দোলনের জন্য এমন একটি ময়দান (বা বাস্তবতা) প্রয়োজন, যেটা তার জন্য ইনকিউবেটর হিসাবে কাজ করবে, যেখান থেকে অঙ্কুরিত বীজ বেড়ে উঠে। সেখান থেকে তারা সামরিক, রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও কর্মগত অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।”

শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম রহঃ বলেন,

> “আন্দোলনের পথে দীর্ঘ দুর্ভোগের তিক্ততা এবং বিশাল ত্যাগ অতিক্রম করার মাধ্যমে তারা নিজেদের হৃদয়কে স্বচ্ছ করে তুলবে, ফলে তারা দুনিয়ার নিম্ন বাস্তবতা থেকে উর্ধ্বে উঠবে, তাদের মন-মানসিকতা সামান্য টাকা-পয়সা, সাময়িক স্বার্থ ও তুচ্ছ ভোগ-সামগ্রীর বাক-বিতণ্ডা থেকে উঁচু হয়ে যাবে এবং হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে। এইভাবে তা আত্মাকে পরিস্কার করে দিবে এবং কাফেলাকে নিচু অবস্থান থেকে উচ্চতর অবস্থার দিকে পরিচালিত করবে, যারা দুর্গন্ধময় জাতীয়তাবাদ ও স্বার্থান্বেষী লড়াই থেকে অনেক দূরে থাকবে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার মাধ্যমে নেতৃত্ব গড়ে উঠে, এর ত্যাগ ও কুরবানির মাধ্যমে যোগ্যতা বিকশিত হয় এবং পুরুষরা তাদের বীরত্ব ও বাহাদুরি প্রকাশ করতে পারে। আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী—রাদিয়াল্লাহু আনহুম—তারা তো এই মহান কর্ম ও সুউচ্চ কুরবানির মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছিলেন।
>
> একারণেই উম্মত আবু বকরকে খলিফা মনোনয়নের ব্যাপারে একমত হয়ে গিয়েছিল। এর জন্য নির্বাচনী প্রচারণার প্রয়োজন হয়নি। ফলে আল্লাহর রাসূলের আত্মা সর্বোচ্চ বন্ধুর পানে জান্নাতের উদ্দেশ্যে উড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের চোখগুলো মাঠে অনুসন্ধানে নেমে গেল। তখন তারা আবু বকর থেকে শ্রেষ্ঠ কাউকে পেল না। যে উম্মত চড়া মূল্য ব্যয় করে পাকা ফল কুড়ায়, তাদের জন্য তাদের রক্ত-ঘামে কুড়ানো ফসলের ব্যাপারে অবহেলা করা সহজ নয়। পক্ষান্তরে যারা (পশ্চিমা) দূতাবাসগুলোর পর্দার আড়ালে তৈরী (গণতান্ত্রিক বা সামরিক) বিপ্লবের প্রথম বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে আসন গেড়ে বসে, তাদের জন্য যেকোন বিষয়েই শৈথিল্য করা সহজ। যে বিনাযুদ্ধে দেশ অধিকার করে নেয়, তার জন্য দেশ সমর্পণ করে দেওয়াও সহজ।
>
> আর দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে প্রকাশ লাভ করা সেরা ব্যক্তিদের নেতৃত্বে পরিচালিত উম্মাহর পক্ষে তাদের নেতৃত্বের ব্যাপারে শৈথিল্য করা বা তাকে বিপর্যস্ত করার ষড়যন্ত্র করা সহজ নয়। আর তাদের শত্রুদের পক্ষেও তাদেরকে তাদের বাহাদুরদের গতিবিধি সম্পর্কে সন্দেহে ফেলা সহজ নয়। দীর্ঘ আন্দোলন তাদের জাতির প্রতিটি সদস্যের মাঝে এই উপলব্ধি সৃষ্টি করে যে, তারা মূল্য আদায় করেছে এবং ইসলামি সমাজ গঠনের জন্য কুরবানিতে অংশগ্রহণ করেছে। ফলে তারা এই নবজন্মা সমাজের প্রহরী ও নিরাপত্তাকর্মী হয়ে যায়, যার প্রসব বেদনা সমস্ত উম্মাহকেই সহ্য করতে হয়েছে। যে কোন ইসলামি সমাজের জন্মের জন্যই প্রসব বেদনা আবশ্যক। আর যেকোন প্রসবকার্যের জন্য কষ্ট-পরিশ্রম আবশ্যক। আর যেকোন পরিশ্রমের জন্য ব্যথা-বেদনা আবশ্যক।”

তিনি আরো বলেন:

> “আমরা যদি কাবুল থেকে আল কুদসের দিকে চলার ইচ্ছা রাখি, তাহলে এ পথটি হল ইসলামি দাওয়াতের পথ, যা যুবকদেরকে প্রতিরোধের জন্য এবং আকিদার জন্য লড়াই করার চেতনায় গড়ে তুলবে, তখনই তারা বিজয় লাভ করবে। এটা ছাড়া আমরা পানিতে চাষাবাদ করব, শূণ্যে বীজ বপন করব। তখন ব্যর্থতার পর ব্যর্থতাই আসবে। আর বিষয়টা যতক্ষণ শুধু ঘোষণা, স্লোগান, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও মুখরোচক কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, ততক্ষণ অবধি তার গন্তব্যে পৌছতে পারবে না।”

[৪]

জাতি নিজ থেকেই বিজয় ইসলামপন্থীদের হাতে উঠিয়ে দেবে—এমন বিপজ্জনক চিন্তা থেকে বেরিয়ে এসে ইসলামপন্থীদের উপলব্ধি

করা প্রয়োজন যে, ইসলামি আন্দোলন ও সংগ্রামের নেতৃত্ব, দিকনির্দেশনা ও প্রতিরক্ষার কাজ সফলভাবে সম্পাদনে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিশুদ্ধ আকিদা-মানহাজ, শক্তিশালী ঈমান, সামরিক ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় সুসজ্জিত এক সংগঠিত গোষ্ঠী। প্রতিকূল পরিবেশেও এমন সংগঠিত দল প্রস্তুতের দৃষ্টান্ত রয়েছে নবিজীর সিরাতে।

আমরা দেখি, রাসুল (সা.) দারুল আরকামে তরবিয়তের মাধ্যমে অগ্রগামী সাহাবীদের পরবর্তী সময়ের সংগ্রামী জীবনের জন্য প্রস্তুত করেছেন, যা মক্কা বিজয়ের আগ অবধি চলমান ছিল। ইসলামি বিপ্লব সাধনের জন্য তাই প্রয়োজন ইসলামি আকিদা ও বিশুদ্ধ মানহাজে সুসজ্জিত ইসলামপন্থীদের অগ্রবর্তী সংগঠন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটেও মুসলিম উম্মাহর অগ্রগামী একটি অংশ কোনো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত সম্পূর্ণ শূণ্য থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে ইসলামের সম্মান পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে। এই দৃঢ়পদ শ্রেণীটির নেতৃত্ব দিয়ে আসছে শাইখ আবু আব্দুল্লাহর গড়ে তোলা জামাআত। কোনো প্রকার রাষ্ট্রীয় সহায়তা ব্যাতিরেকে কোনো জাতিকে পূর্বের জাহেলি শাসন থেকে মুক্ত করতে ইসলামপন্থীদের জন্য জরুরী যে, তারা শারঈ মূলনীতির আলোকে, ফলপ্রসূ রাজনৈতিক ও সামরিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দাওয়াহ, সংগঠন, তরবিয়ত, প্রস্তুতি গ্রহণ ও পর্যায়ক্রমিক নানামুখী প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করবে। যার ফলে পূর্ববর্তী শাসন দুর্বল হবে এবং ক্ষমতার কেন্দ্রে ইসলামপন্থীরা নিজেদেরকে প্রতিস্থাপনে সক্ষম হবে।

ইতিহাসে এই মানহাজের বাস্তবতা পাওয়া যায়, মুরাবিতি সাম্রাজ্য, উসমানি সাম্রাজ্যের দৃষ্টান্ত থেকে। তুলনামূলক দূর্বল কোনো শক্তির জন্য-

দাওয়াহ > সংগঠন> প্রস্তুতি, তরবিয়ত ও জনগণকে সংগঠিতকরণ > তীব্র ও কার্যকর রাজনৈতিক পদক্ষেপ > প্রতিষ্ঠা লাভ।

এই ধারাবাহিকতাই হচ্ছে বাস্তবসম্মত, বিশুদ্ধ, সুসাব্যস্ত ও সার্বজনীন প্রক্রিয়া। আর আন্দোলনের প্রত্যেক স্তরেই আবশ্যক ঈমান, তাওয়াক্কুল, ইস্তি'আনা, মুহাসাবা, সবর ও অধ্যবসায়। আর অপরিকল্পিত, স্বতঃস্ফূর্ত মেহনত ইসলামের জন্য কল্যাণকর হলেও, প্রতিষ্ঠা লাভে কার্যকর নয়।

নির্মোহ দৃষ্টিতে খেয়াল করলে দেখা যাবে, সফল রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা ও সংগঠনে নূন্যতম সংখ্যক সদস্যের একটি অগ্রবর্তী বাহিনী (ভ্যানগার্ড পার্টি) থাকে, যারা উম্মাহর দিকনির্দেশনা ও নেতৃত্বের জিম্মা গ্রহণ করে। পাশাপাশি, জাতির এই অগ্রবর্তী অংশটির শারঈ ইলম, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, সাংগঠনিক দক্ষতা ও অ্যাক্টিভিজমের যোগ্যতার সাথে থাকতে হয় ধীশক্তি ও যথাযথ সামরিক-রাজনৈতিক জ্ঞান। এর ফলে ক্রম-পরিবর্তনশীল বাস্তবতার আলোকে দ্রুত বা প্রয়োজনীয় সমস্যা/পরিস্থিতি চিহ্নিতকরতঃ তদানুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়।

দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের পূর্বের ও সমসাময়িক ইসলামি সংগঠনগুলোতে এই সমস্যাটি প্রকটাকারেই দেখা যায়। পূর্ব অভিজ্ঞতায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আগেরজন যা বলেছেন, পরের জন তার সবই সঠিক মনে করেছেন। কিন্তু পূর্বসূরীর চিন্তাধারার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার মত মেধা, প্রজ্ঞা, ইচ্ছা কোনটাই সাধারণত এর ফলে উত্তরসূরীর মাঝে থাকে না। তাই দেখা যায় নীতিনিষ্ঠ শিষ্যের মত সারা জীবন পূর্বসূরীদের দেখানো পথে চলতে চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তি বা জামাতের সততা, নিষ্ঠা এবং তার বিশ্বাসের প্রতি আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত থাকলেও বাস্তবতা উপেক্ষা করা উচিত নয়। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, বাস্তব ময়দানে সফল হবার জন্য এসব গুণাবলীই শেষ কথা নয়। জামাত হিসেবে তো বটেই, এমনকি আদর্শের পতাকাবাহী হিসেবেও অনেকে তাই সফল হতে পারেননি। আমরা ভুলে যাই, ইতিহাসের ট্র্যাজেডি হলো ইতিহাস ব্যর্থ মানুষদের মনে রাখে না।

ব্যক্তি পর্যায়ে কবুলিয়াত অর্জনের চেষ্টা আর জাতির জিম্মাদারি আদায়ের মাঝে রয়েছে বহুমুখী ও ব্যাপক ব্যবধান। আল্লাহর সাহায্যে বর্তমানে অগ্রগামী ইসলামপন্থীদের মাঝে যোগ্য ব্যক্তি অপ্রতুল হলেও অল্প কিছু ব্যক্তির মাধ্যমেই যে ইতিহাসের মানচিত্র পালটে দেয়া সম্ভব তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আরো প্রমাণ হয়েছে, আমাদের পথ কষ্টকর আর দীর্ঘ হলেও—তা বোধগম্য, সরল ও সাবলীল। বাস্তবিক দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জনের ঝক্কি এড়াতে কিংবা নিজের অক্ষমতা ও অলসতা গোপন করতে, তাওয়াক্কুল, গায়েবি নুসরত আর আসন্ন বিজয়ের গালভরা বুলি দিয়ে সাময়িক ফায়দা অর্জন করা গেলেও, এজাতীয় বুদ্ধিবৃত্তিক

অসততা আখেরে কেবল আফসোসই টেনে আনবে; অতীত অন্তত আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। আর এমন চিন্তাধারা আদতে আল্লাহর রাসুল (সা.) এর ২৩ বছরব্যাপী সুপরিকল্পিত ও সূক্ষ্ম জীবনযাত্রাকে তাচ্ছিল্য করারই নামান্তর! যেমন বলা হয়—

আমাদের এসময়ে আত্মনিমগ্ন সূফী দরবেশ বা তোতাপাখির প্রয়োজন নেই।

আর নববি মানহাজের আলোকে পরিচালিত বিপ্লবী আন্দোলনের পথে আগত পরীক্ষা ও বিপদই যোগ্য নেতৃত্ব ও জামাত গড়ে তোলে-

শায়খ আবু কাতাদা আল ফিলিস্তিনি বলেন,

> "যদি কোন ইনসাফগার গবেষক এই উম্মতের সত্যবাদী লোকদের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য বা একনিষ্ঠ উলামাদের বিশেষ কোনো নিদর্শন দেখতে চায়, তবে তিনি সুস্পষ্টভাবেই দেখতে পাবেন যে, এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব হলো (তাদের উপর আগত) পরীক্ষা বা বিপদ। এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর বাস্তবতা—
>
> ((أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل)).. و((يبتلى الرجل على قدر دينه))،
>
> "মানুষের মধ্যে সর্বাধিক কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন নবিগণ। তারপর যথাক্রমে যারা তাদের সাথে অধিক সাদৃশ্য রাখে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার দ্বীন অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়।"

কিন্তু মানুষ আরেকটি বিষয়ও সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করতে পারবে যে, বর্তমান যামানায় ইসলামি সংগঠনগুলোতে নেতৃত্বের স্তরে পৌঁছার জন্য বা এবং পরিচালনার আসন দখল করার পথ এমন যে, যার জন্য আদৌ বিপদ ও পরীক্ষার মাধ্যমে অতিক্রম করতে হয় না। বরং, তাদের এমন পথ অতিক্রম করতে হয়, যাকে সত্যিকারার্থে ব্যক্তির সততা ও দ্বীনদারিতা বলা যায় না।

আমরা চাই বা না চাই, কিছুতেই আমরা সঠিক পরিবেশ ছাড়া প্রকৃত নেতৃত্বের জন্ম দিতে পারবো না। সেই পরিবেশ হলো (সংঘাত, কঠিন পরিস্থিতি বা) জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। তখনই এমন নেতার আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যার চারপাশে চরম কঠিন ও ভয়ংকর পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও দৃঢ়তার স্থানে সমস্ত জামাত সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। যা এক কঠিন পরিস্থিতি। যা খনিগুলোকে তার প্রকৃত অবস্থায় প্রকাশিত করে। তখনই নেতৃত্বের খনি সকল ত্রুটি ও কলুষতা থেকে মুক্ত হয়। সে ই হয় প্রকৃত নেতা, যিনি এই পদের উপযুক্ত। বরং পদটিই তাকে নিয়ে গর্ব করে ও মর্যাদাবান হয়।

কিন্তু প্রচারণা ও স্থবিরতার যুগে, হীনতা ও নীচতার যুগে এবং লাঞ্ছনা ও অপমানের পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে এমনই নেতা উপস্থিত হয়, যার সর্বোচ্চ সম্বল হলো আবেগময়ী ও প্রতিশোধমূলক বক্তব্যের দক্ষতা, যা শ্রোতাদের বিবেককে বন্দি করে ফেলে।

ফলে সাধারণ চিন্তার লোকগুলো দৌড়ে গিয়ে তাকে নেতা বানাতে থাকে।

বিশুদ্ধ নেতৃত্ব অনুসন্ধানের এটাই কি প্রকৃত পথ?

অথবা, আমাদের মাঝে কোন আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রচারণা লাভের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের আবির্ভাব ঘটে, চাই তা ম্যাগাজিন প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞাপন প্রচার বা পত্রিকা প্রকাশের সামর্থ্যের মাধ্যমেই হোক না কেন; এর মাধ্যমে সে মানুষের মাঝে মর্যাদা অর্জন করে । ফলে মানুষ তাকে প্রথিতযশা লেখক বা বিচক্ষণ রাজনীতিক হিসাবে জানবে, আর সে নেতা হয়ে যাবে! এটাই কি প্রকৃত নেতৃত্ব নির্বাচনের সঠিক পথ?

এ হলো কয়েকটি উদাহরণ। আপনি এর সাথে বাকি সবগুলোকে মিলিয়ে নিন। তাহলেই বুঝতে পারবেন যে, প্রকৃত নেতৃত্ব শনাক্ত করা যাবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মাধ্যমে। কঠিন ও সংকটময় সময়গুলোতে।

ইসলামি সংগঠনগুলো সবচেয়ে কঠিন যে সমস্যাটির সম্মুখীন হয়, তা হচ্ছে, সংগঠন ও দলের জন্য উপযুক্ত নেতা ও বিশুদ্ধ মানহাজ না থাকা। নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত সময় পাওয়া সত্ত্বেও সর্বদাই তাই পদক্ষেপগুলো ব্যর্থ হয়েছে।

আমরা দেখতে পাই, মুসলিম যুবকগণ যতদিন পর্যন্ত তাদের নেতৃবৃন্দ ও দায়িত্বশীলদের থেকে দূরে থাকে, ততদিন পর্যন্ত তাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধাশীল থাকে। তারপর যখন তার সঙ্গে চলাফেরা ও সহাবস্থান করে, তখনই তার আস্থা নড়বড়ে হয়ে যায় এবং শ্রদ্ধা শেষ হয়ে যায়। তখন তার নেতৃবৃন্দ ও মাশায়েখদের ভুলগুলো বলার ক্ষেত্রেই তার আওয়াজ উঁচু হতে থাকে। এটাই জোরালোভাবে প্রমাণ করে যে, এই সংগঠনগুলা যে পদ্ধতিতে নেতৃত্ব তৈরী করছে, তা ভুল ও নষ্ট পদ্ধতি।

পরিশেষে, গুরুত্ব বিবেচনায় পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে যে, আমাদের জন্য আবশ্যক হলো উম্মাহকে সব রকমের পদস্খলন থেকে রক্ষা করা এবং তাদেরকে সাধ্যমত বিশুদ্ধ মানহাজের আলোকে পরিচালিত আন্দোলনের অনুগামী করা। যার ফলে তারা তাদের সুনির্বাচিত ও অগ্রগামী লোকদেরকে উম্মাহর নেতৃত্বদানের গৌরবময় মহান কাজে শরীক করবে। পাশাপাশি, ইসলামপন্থীদের জন্য আরো আবশ্যক যে, তারা হয় অগ্রবর্তী শ্রেণীকে চিহ্নিত ও মজবুত করবেন, জাতিকে সচেতন করে তুলবেন, অথবা সরাসরি অগ্রবর্তী শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন বা চেষ্টা করবেন। কেননা, বিশুদ্ধ মানহাজের আলোকে, আমানতদার ও সুযোগ্য নেতৃত্বের দেখানো পথ ও পন্থার উপর সকলের মেহনতকে একত্রিত করার মাধ্যমেই কেবল জাতি ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারে।

সর্বোপরি সবারই স্মরণে থাকা কাম্য বিধায় আবারো বলছি—দেরীতে হলেও পরিচ্ছন্ন লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারা, ভ্রান্ত গন্তব্যে চলা এবং লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থতা থেকে উত্তম।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিষয়টি বোঝার তাওফিক দিন। আমিন।